

বিজ্ঞানে অধ্যাপনা-গবেষণার ভারতীয় ধারা

অত্রি মুখোপাধ্যায়

১. উপক্রমণিকা

জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর Man and Superman গ্রন্থে Maxims for Revolutionists অংশে বলেছেন, He who can, does, he who cannot, teaches. শ কী প্রসঙ্গে এবং কী যুক্তিতে পড়ানোর কাজটিকে গৌণ সাব্যস্ত করেছিলেন বলা মুশ্কিল, কিন্তু অনতিঅতীতে এক শ্রেণীর গবেষক এ উক্তিটির প্রথম ত্রিয্যাপদখানিতে ‘বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান’ অর্থ আরোপ করে পড়ানোর কাজটিকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, এই উক্তি একমাত্র উচ্চ কোটির বিজ্ঞানীরাই করতে পারেন। দ্বিতীয় এবং মজার ব্যাপার এই যে, এ কথাটি তাঁরা আদর্শে বলেনই না, কারণ গবেষণা আর অধ্যাপনার কেবলমাত্র যুগলবন্দীতেই তাঁরা বিশ্বাসী।

ভারতবর্ষে এর বিরুদ্ধ শ্রেণীটির উদ্ভব হয় স্বাধীনতার পরে, বিশেষত জাতীয় গবেষণাগার-গুলি ও পরমাণু শক্তি আয়োগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে। সেখানে গবেষণাটাই একমাত্র কৃত্য, অধ্যাপনার অবকাশ প্রথম থেকেই নেই। সেই প্রথম আমাদের দেশে গবেষণাকে অধ্যাপনা থেকে আলাদা করে দেওয়া হল। আর এই পৃথকীকরণ আজ এতটাই সম্পূর্ণ যে, কখনও যদি সেখানে কোনো শিক্ষা-কার্যক্রম প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেমনটি এখন হচ্ছে, তার রূপায়ণ এবং সার্থকতা অনেকটাই ব্যাহত হয় এই বিরুদ্ধ শ্রেণীর মনোভাবে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁরা বলেন, তাঁদের কাজ গবেষণা করা, পড়ানো নয়।

পক্ষান্তরে, বিশ্বের সর্বত্র, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষেও যেমন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেই, যারা তা করেন বা করান তাঁরা মূলত শিক্ষক, পড়ানো তাঁদের একটি আবশ্যিক কৃত্য। এই ধারাটি পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশে আজও অব্যাহত। মার্কিন মুলুকে, যত বড়ো বিজ্ঞানীই হোন না কেন, সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস প্রত্যেককেই নিতে হয়—এমন কি নোবেল পুরস্কারজয়ীও তা থেকে বাদ যান না। এটা যে শুধুই বাধ্যবাধকতার ব্যাপার তা নয়। আসলে, তাঁরা এ কাজ দুটিকে অচ্ছেদ্য বলে মানেন।

অধ্যাপনাবিমুখ এই বিজ্ঞানীদের গবেষণা যে সব সময় আহামরি গোছের হয় তা নয়। নানা দিকে বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটায় এখনকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলে এক-একটি সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে। ফলে, ছাত্রাবস্থায় গলাঃধকরণ করা কিছু শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ গবেষকদের সম্পর্ক দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসে, তাঁদের গবেষণায় সেগুলি আর সরাসরি প্রাসঙ্গিক হয় না বলে। কিন্তু যেকোনো উচ্চ মানের গবেষণায় দৃষ্টির প্রসারতা অপরিহার্য, তুচ্ছতম জ্ঞান, যত আপাত-অসম্বন্ধিতই হোক না কেন, তাও গোপনে কাজ করে বাঞ্ছিত প্রসার ঘটায়; অধ্যাপনা ছাড়া আর কোন উপায় আছে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার? আর কী ভাবে সেসবের অর্থ ও প্রয়োগ-সম্ভাবনার নিয়ত বিস্তার ঘটতে পারে, পারে নতুনেরও সন্ধান দিতে? অধ্যাপনার এই বিশেষ ভূমিকার টুকরো কিছু দৃষ্টান্ত আমরা লেখাটির পরবর্তী অংশে দেখতে পাব।

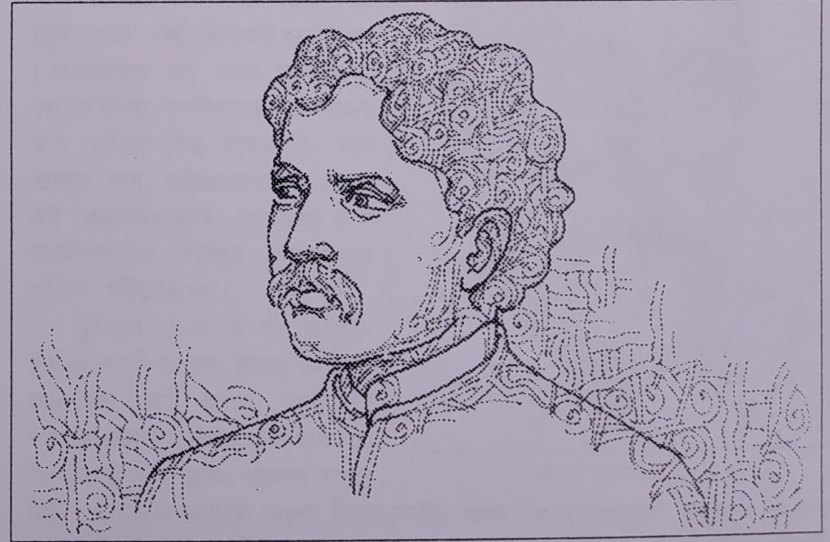
স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে গবেষণার কাজ সম্পন্ন হত মুষ্টিমেয় কিছু কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চল হয় অনেক পরে। পড়ানোর চাপ দু’জায়গাতেই যথেষ্ট, তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে তৈরি হয়েছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পরে স্যর সি ভি রামন, এবং আরো পরে শিশিরকুমার মিত্র, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও বিজ্ঞানী হিশেবে যাঁদের খ্যাতি তুল্যমূল্য। মাঝখানের একটি সময়ে ক্ষীয়মাণ এই ধারায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য নাম অমলকুমার রায়চৌধুরী। এর পর প্রায় এক প্রজন্মের ব্যবধানে এসেছেন এক ঝাঁক নবীন অধ্যাপক-বৈজ্ঞানিক। আশার কথা, এঁরা গবেষণা-অধ্যাপনার যুগলবন্দীকে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী।

২. দুই আচার্য, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র

প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরনো বাড়িটির একতলায়, সিঁড়ির ডানদিকের ছোটো একটি ঘরে একজন মানুষ যন্ত্রপাতি নিয়ে একাগ্র চিত্তে কী সব করে চলেছেন! গৌরবর্ণ, নাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা। দেহের তুলনায় মাথাটি বড়ো, সুবিন্যস্ত একরাশ ডেউখেলানো চুল। প্যাস্নের আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত আয়ত চোখ, ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডলে ঘন গুন্ফশোভা।

বর্ণনাটি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক ড. জগদীশচন্দ্র বসুর। পরনে সাহেবী পোশাক না থাকলে কি হয়, কলেজে সবাই তাঁকে ‘বোস সাহেব’ বলে [যোগেশচন্দ্র রায়, আত্মচরিত]।

কলেজে নিয়োগ থেকে ইওরোপীয় আর ভারতীয় অধ্যাপকদের মাইনের বৈষম্য নিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের অভূতপূর্ব সংগ্রাম, এ সবই কাহিনি হয়ে ছাত্রদের মুখে মুখে ফেরে। বাকি অধ্যাপকদের সাথে তাঁর তফাৎও চোখে পড়ার মতো। অবসর সময়ে হয় ফোটোগ্রাফি, নয়তো নতুন এক্স-রে যন্ত্র, কিংবা সদ্য আসা ফোনোগ্রাম যন্ত্র নিয়ে তিনি



জগদীশচন্দ্র বসু

শিল্পী : সৌরীশ মিত্র

সদাব্যস্ত। ১৯১৩-তে তাঁর ঘর বেকার লেবরেটরিজ ভবনে স্থানান্তরিত হলেও ছবিটি সেই এক, রহস্যময় যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে নিমগ্ন। সহকারী নাকুরাম আর বরদা প্রসন্ন ঘোষ তাঁর নির্দেশমত যন্ত্রপাতি বানিয়ে দেন কলেজেরই ক্রিয়াশালায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র সমাগমের অন্যতম কারণ তিনি। তবে এফ এ (১৯০৮ থেকে ইন্টারমিডিয়েট) ক্লাসের ছেলেরা তাঁকে পায় না, জগদীশচন্দ্র পড়ান উঁচু ক্লাসে, বিষয় তাড়িতবিদ্যা। সুবাসী তাঁকে বলা যায় না, একটু উত্তেজিত হলে তোৎলাতে থাকেন। কিন্তু যা পড়ান তা ক্লাসেই হাতে-নাতে করে দেখান। সেই আকর্ষণে অন্য কলেজের ছাত্ররাও এসে তাঁর ক্লাসে ভীড় জমায়। দোতলার বক্তৃতাঘরে ক্লাসের আগে বেয়ারা এসে টেবিলে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে দেয়, বোস সাহেবের পড়ানো দু'শতাধিক ছাত্রের মনে গেঁথে যায়। কলেজে তাঁকে নেবার সময় কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল অত বড়ো ক্লাস জগদীশচন্দ্র কী করে সামলাবেন, কিন্তু অচিরেই দেখা যায়, বিশৃঙ্খলা দূরে থাক, তাঁর ক্লাস পারতপক্ষে কেউ ফাঁকি দিতে চায় না, বরঞ্চ এত ভীড় হয় যে, ছেলেদের মেঝেতে বসতে হয়। সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা ক্লাসের কোনোটাই বাদ পড়ে না। কলেজের সাহেবরা সে কারণে তাঁকে বেশ সমীহ করে চলেন।

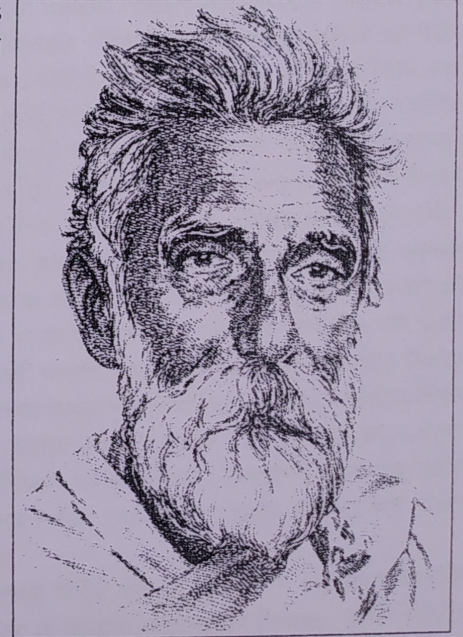
কথিত আছে, জগদীশচন্দ্রের গবেষণাবাদ কলেজে জায়গা বরাদ্দ ছিল মাত্র 20 ft square, মানে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২০ ফুট, সেকালের তুলনায় যা খুব বড়ো না-হলেও অল্প নয়। জগদীশচন্দ্রের নিজের কথায়, ১৮৯৪-এর নভেম্বর তাঁর গবেষণার সূচনাকাল। অথচ, ১৮৮৯ সালের (অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র নিযুক্ত হবার চার বছরের মাথায়) কলেজের ভৌতবিজ্ঞানের ক্রিয়াশালায় আয়তন অনেকটাই, 'নীচ তলার চার-চারটি বড়ো ঘর নিয়ে বোস সাহেবের তাড়িত-ক্রিয়াশালা' [যোগেশচন্দ্র রায়, তদেব]। কেবল একটি ঘরে আছে ক'টা দামী তাড়িত যন্ত্র। সেখানে বসে এক বিহারী বেহারা, নাম নোকু (মতান্তরে নাকুরাম), আর-এক 'পন্টন-ফেরৎ গোরা কানে খাটো মিস্ত্রী। এই সব ঘরে টেবিলের দেরাজে দেরাজে যন্ত্র। বিলতে থেকে আসা বাস্তব অনেক-গুলি তখনও খোলা হয় নি। শেষের দিকে একটা ছোটো ঘরে স্টীম এঞ্জিন আর ডাইনামো, মিস্ত্রী ডাইনামো চালিয়ে ওঁতা বড়ো বড়ো তাড়িত আধান (accumulator) তড়িতে পূর্ণ করে' [তদেব]। যোগেশচন্দ্র সেবছর অস্থায়ী সহকারী নিযুক্ত হবার আগে বোস সাহেব নিজেই এসবের দেখাশোনা করতেন। এখন তিনি রোজই রায়কে কিছু-না-কিছু কাজ দেন, তাতে তাঁরও শেখা হয়। ভৌত-বিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক তখন W. Booth.

জগদীশচন্দ্রের এই সময়কার অধ্যাপনা ও কাজকর্ম সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় না। প্রথম যুগের ছাত্র বলে যাঁদের নাম করা হয়, তাঁরা কেউ এ নিয়ে কিছু লেখেন নি। এক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাড়া এঁদের কেউই পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছিলেন না। জগদীশচন্দ্রের চেয়ে সাত বছরের ছোটো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জগদীশকে পান সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে এফ এ পাশ করে প্রেসিডেন্সিতে বিজ্ঞান নিয়ে বি.এ. পড়ার সময়। জগদীশচন্দ্রের শিষ্য তিনি সেই সুবাদে। ঘটনাচক্রে তাঁকে পরীক্ষাটা দিতে হয় পরের বছর সিটি কলেজ থেকে। সেবার তিনি বি.এ.-তে প্রথম হয়ে মোটা অঙ্কের জলপানি পান। অমল হোম তাঁর সম্পর্কে লিখছেন, no pupil ever held a teacher in greater esteem and no teacher admired a pupil more for his great qualities [Acharya Jagadishchandra Bose Birth Centenary Volume, Bose Institute]. রামানন্দের গুণাবলি প্রশ্নাতীত এবং এও সত্য যে, তাঁর সঙ্গে

জগদীশচন্দ্রের গভীর সখ্য স্থাপিত হয়েছিল। অমল হোমের কথায়, (জগদীশচন্দ্র) looked upon him as a friend whom he took into confidence and whose counsel he sought through-out an unbroken period of fifty years [*ibid*]. এই রামানন্দ পরে প্রবাসী এবং *The Modern Review* দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে গিয়েছেন। অমল হোম আরও লিখছেন, No journals did more than those conducted by Ramananda Chatterjee in making known the work and achievements of Jagadis Chandra Bose [*ibid*]. জগদীশচন্দ্রের প্রথম দিকের ছাত্র বলে আরও কিছু নাম শোনা যায়, যেমন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; এঁরা কেউ বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। জগদীশচন্দ্র যখন ১১৮ নম্বর বৌবাজার স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন তখন এঁরা প্রায়ই সেখানে সাক্ষ্য-আড্ডায় মিলিত হতেন। মুড়ি সহযোগে নানান বিষয়ে আলোচনা হত। রামানন্দ লিখছেন, জগদীশচন্দ্র কখনও কখনও রাস্কিন থেকে অংশবিশেষ তাঁদের পড়ে শোনাতে। অনুমান হয়, তখনও তিনি গবেষণা শুরু করেন নি।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রেসিডেন্সিরই ছাত্র, ঢোকেন ১৮৮১ তে, জগদীশচন্দ্র ঢোকের চার বছর আগে। ১৮৮৩-তে তিনি বিজ্ঞানে সাম্মানিক। তাঁর এম এস সি ক্লাসের শেষের দিকেই কেবল তিনি জগদীশচন্দ্রকে পেয়ে থাকবেন; বেশি করে ১৮৮৮ তে পি আর এস পাবার পর যখন তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে বিনা জলপানিতে গবেষণা শুধু করেন। শোনা যায়, সাময়িক পত্রে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত পড়ে তিনি প্রথমে একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন [সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রচনা সংকলন]। কোনো কারণে জগদীশচন্দ্র তাঁর কাজের কথা কাউকে কিছু বলেন নি। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এই রামেন্দ্রসুন্দরই আমাদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের কাজের নির্ভরযোগ্য পরিচয় ঘটিয়েছিলেন।

খুব ভুল হবে না যদি বলি, তাড়িত-বিদ্যায় জগদীশচন্দ্রের আগ্রহ কেন্সিজে ছাত্রাবস্থায় তৈরি হলেও, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ানোর বিষয় আর যন্ত্রপাতির ব্যাপারে তাঁর অসামান্য দক্ষতার সুবাদে তিনি সেকালের ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য বিদ্যুতচুম্বকীয় তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ) উৎপাদন ও তার ধর্মাদর্ম নিরূপণে অনুপ্রাণিত হন। আর, এই আগ্রহই তাঁকে ক্রমে ক্রমে তাঁর কাজের পরবর্তী পর্ব দুটিতে পৌঁছে দেয়।



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মাইক্রোওয়েভ আর জড় ও জীবের ঐক্য, এ দুই পর্ব পেরিয়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা যখন উদ্ভিদের সাড়া পর্যায়ে পৌঁছয়, তখন তাঁর জগতজোড়া খ্যাতি। সে সময়ে তাঁর অধ্যাপনার কথা বহুলাংশেই এই খ্যাতির অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন কাজে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, এমন কি বিদেশে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। সেই ব্যস্ত সময়ে (১৯০৯) এক ঝাঁক উজ্জ্বল ছাত্র প্রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে কেবল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকেই জগদীশচন্দ্রের সে আমলের অধ্যাপনা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। ১৯০৯-এ ম্যাট্রিক দিয়ে যখন তিনি বিজ্ঞান পড়া স্থির করলেন, তখন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী বাংলা সাময়িকীতে প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, ছাপা বিবরণী সব সময় ঠিকও হয় না, যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘জড়ের মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব তিনি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণ করিয়াছেন।’ সে যাই হোক, তিনি বলছেন, “আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, এই দুই আচার্যের পায়ে কাছ বসিয়া বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় শুরু হইবে—এই আশায় আমার মতো বহু ছাত্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসিল। প্রথম বৎসরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে রসায়ন শিক্ষার সৌভাগ্য হইল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে পড়িবার সুযোগ আসিল তারও দুই বৎসর বাদে। ইতিমধ্যে, যাহারা একটু বেশী বাহিরের খবর রাখে, তাহাদের মতো আমিও মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে গিয়া Response in Living and Nonliving-এর পাতা উন্টাই। জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় তখন Magnetic Crescograph-এর যুগ। জগদীশ-চন্দ্রের নির্দেশমত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রেসিডেন্সি কলেজের কারখানাতে তৈয়ারী হয়। আমরা তাঁহার অধ্যাপনার জন্য উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করি। আচার্য তখন তাঁর গবেষণায় নিমগ্ন। কাজেই তাঁর অবসর কম। তবু তাঁহার কাছে যে কয় দিন পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সে কয়দিনের কথা সারা জীবনে স্মরণে থাকিবে। বিশেষত যখন তাঁহার নিজের যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসেই ক্লাসঘরে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, সাধারণ আলোকতরঙ্গের সকল ধর্মই বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বিদ্যমান।... বি এস সির পরে ফলিত গণিতের ক্লাসে ভর্তি হই। ইতিমধ্যে বেকার লেবরেটরীর বাড়ীতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার উঠিয়া গিয়াছে। ...আমরা কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে সেই রহস্যপূর্ণ লেবরেটরীর মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারি।”

তাঁর দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছে, উত্তরকালে তাঁদের অনেকেই ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-গগনে এক-একটি নক্ষত্রসম হয়ে উঠেছিলেন। অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের সকলেরই, এই আচার্যের প্রতি। তবে লক্ষ্য করতে হয়, ছাত্রাবস্থায় তাঁদের কাউকেই খুব কাছে আসতে দেন নি তিনি। এদের কারও সঙ্গে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এমন নিদর্শনও নেই। বেশির ভাগ কাজই তাঁর একা হাতে করা, ছাত্ররা কখনো-সখনো যন্ত্রপাতি তৈরিতে তাঁকে সাহায্য করেছেন বা তাঁর নির্দেশমতো কাজ করেছেন, এই পর্যন্ত। বাদবাকি সবই সত্যেনের ভাষায় ‘রহস্যময়’। সে অর্থে এবং খানিকটা সেই কারণে, তাঁকে ঘিরে এমন কোনো ধারাবহ ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি হয় নি যাকে ‘জগদীশচন্দ্র স্কুল’ বলা যায়। প্রথম দিকের ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশার যে-সামান্য গল্পগাছা শোনা যায়, পরের দিকে তা বিরল। তবে, ছাত্রদের স্নেহ করতেন, নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করতেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাকতেন। তাঁর সন্তরতম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এঁরা সকলেই বিভিন্ন কর্মস্থল থেকে ছুটে এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবেও এঁদের সাদর নিমন্ত্রণ ছিল।

জগদীশচন্দ্রের চার বছর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন আর-এক অধ্যাপক। তাঁর নিয়োগ নিয়ে ছাত্রমহলে তেমন কোনো কাহিনি রচিত হয় নি, হবার কোনো কারণও ছিল না, প্রফুল্লচন্দ্র রায় জগদীশচন্দ্রের মতো অত সৌভাগ্যবান ছিলেন না। অস্থায়ী পদে হলেও জগদীশচন্দ্র ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসভুক্ত হন, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিস গ্রহণ করতে হয়েছিল পারিবারিক বিপাকে। ইংরেজদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মতো লড়াই চালিয়ে যাবার মতো শক্ত জমি তখন তাঁর পায়ের তলায় ছিল না। ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন অন্য ভাবে। এ মানুষটি আকারপ্রকারেও জগদীশচন্দ্র থেকে অনেকটাই আলাদা। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, অপুষ্ট মুখমণ্ডল, সদা-অবিন্যস্ত মাথার চুল। পোশাক-আশাকেও নিরাড়ম্বর। কেবল চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল, কৌতুকাঙ্কুল। এটি লক্ষ্য না-করলে কেউ বলবে না, ইনি ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এডিনবরা থেকে স্নায়ু ডি এস সি করে ফিরেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি আকর্ষণ যদি জগদীশচন্দ্র, অন্যটি প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর অধ্যাপনার প্রথম দিকের কথা তিনি নিজেই কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর আত্মচরিত-এ। বিলেত-ফেরত অনেকেরই একটু অহংকার থাকে, কারও কাছ থেকে তাঁরা কিছু শিখতে চান না। তিনি কিন্তু পেডলার সাহেব (যাঁর ক্লাস করতে তিনি নিজে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে প্রেসিডেন্সিতে যেতেন) বা তাঁর হাতে গড়া চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর সহায়তা নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। লিখছেন, “ক্লাসে কি রূপে নিপুণতার সহিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয় আমি পুনঃ পুনঃ তাহার মহড়া দিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমি স্কোচের ভাব কাটিয়া উঠিলাম এবং পরবর্তী সেশন আরম্ভ হইলে দেখিলাম আমি আমার দায়িত্ব পালনে অপটু নহি।/ল্যাবরেটরীর কাজে এবং ব্যবহারিক ক্লাস চালাইতে আমার অন্যের নিকট শিখিবার কিছু ছিল না। কেননা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ‘হোপ প্রাইজ স্কলার’ রূপে অধ্যাপকের সহকারীরূপে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছে। প্রথম তিন মাস আমাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার আনন্দই হইয়াছিল। ক্লাসে যাইয়া বক্তৃতা করিবার পূর্বে প্রায়ই বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া লইতাম। এই নূতন কাজে আমার খুব আগ্রহ ও উৎসাহ হইল, কেননা এই কাজ আমার পক্ষে বেশ স্বাভাবিক এবং মনোমত বোধ হইল। সেশনের প্রথম তিন মাস অর্থাৎ জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বরের পর পূজার ছুটি আসিল। পেডলার তিন মাসের ছুটি লইয়া বিলাতে গেলেন এবং রসায়ন বিভাগের সমস্ত ভার আমার উপর পড়িল। এক হিসাবে আমার শিক্ষক জীবনে সর্বাপেক্ষা কার্যবহুল সময় এই, কখনও কখনও আমাকে পর পর তিনটি ক্লাসে বক্তৃতা করিতে হইত।/শিক্ষকরূপে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসহ বক্তৃতা দেওয়াতেও একটু নৈপুণ্য লাভ করিলাম। এখন আমি অবসর সময়ে গবেষণা কার্য করিতে লাগিলাম” [প্রফুল্লচন্দ্র, আত্মচরিত]।

ক্লাসের জন্য তাঁর এই প্রস্তুতি এতটাই নিখুঁত ছিল যে, ক্লাসে তাঁর পড়ানোকে স্বাভাবিক কথাবার্তার বাইরের কিছু বলে মনে হত না ছাত্রদের। সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, “তিনি ইন্টারের ছাত্রদের পড়াতেন।” আচার্য নিজেই চাইতেন তা, ‘কারণ তারা তখন tender aged-’, তাঁর কথা তাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করবে’ [নিমাইদাস রায়চৌধুরী, আচার্য স্মরণে]। সত্যেন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আরও বলছেন, “পুরনো বাড়ির দোতলায় উত্তর-পূর্ব কোণে গ্যালারিতে ক্লাস বসত, সেখানে অনেক সময় অন্য কলেজের ছেলেরাও এসে জুটতো ড. রায়ের বক্তৃতা শুনতে।

সরল ইংরেজিতে বক্তৃতা, বাগ্মিতার কোনো চেষ্টা ছিল না—বরং নানা কথা বলে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ড. রায় চাইতেন রসায়নের মূল কথা যাতে ছাত্রদের মনে গেঁথে যায়। সে সময়ের হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী, তাঁর কাছে যারা রসায়ন পড়েছে তাদের চিরকাল মনে থাকবে। আণবিক আকর্ষণ বোঝাতে গিয়ে তিনি পাশের সীতারাম বেয়ারাকে জড়িয়ে ধরলেন—এই প্রকার আরও কত কী। এতে ক্লাসে মাঝে মাঝে হাসির অট্টরোল উঠতো, তাতে তিনিও খুশী হতেন। গল্পছলে বলে যেতেন মহারথী বিজ্ঞানীদের কথা—লাভসিয়র, ডাল্টন, বাজিলিয়স, পাস্তুর—আবার কখনো কখনো নাগার্জুনের নাম শোনা যেত। ভারতে যারা অ্যালকেমির চর্চা করতো, সে কথা শুনাতেন ছাত্রদের। পুরনো পুথির দু-চারটি শ্লোক আওড়ালেন, আবার কখনও ইংরেজী সাহিত্য থেকে লম্বা উদ্ধৃতি হলো। এই সব মিলিয়ে সেই ২ বছরের ভাষণের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে অপূর্ব আকার নিয়ে রয়েছে।” অন্যত্র কোথাও পড়েছি, ছেলেদের কুসংস্কার কাটাতে গরুর হাড় পোড়া ছাই কখনও কখনও নিজের মুখে পুরে দিতেন, বলতেন, এ ক্যালসিয়াম অক্সাইড ছাড়া কিছু না, খেলে জাত যায় না। ক্লাসে সব সময়েই যে রসায়ন-বৃত্তান্ত থাকত তা নয়, বিভিন্ন সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধেও শিক্ষা দিতেন তিনি। ১৯১৫ সালের কথা, খবরের কাগজে পড়েছেন, পণরক্ষা থেকে বাবাকে বাঁচাতে স্নেহলতা বলে একটি মেয়ে আত্মঘাতিনী হয়েছে। সেদিন ছাত্রদের বলেছেন, each and every one of you is a potential killer of Snehalata [নিমাইদাস রায়চৌধুরী]। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্ররা রসায়নে তেমন ভালো ফল না-করতে পারায়, উপাচার্য কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি সদর্পে বলেছেন, ‘আমি রসায়ন পড়াই, সিলেবাস পড়াই না’ [Acharya Jnanchandra Ghosh Birth Centenary Souvenir]।

সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কথায়, “শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের সুনাম কলেজে আমার ছিল না। তাছাড়া গুরুজনের মুখের উপর প্রত্যুত্তর দেবার রোগে সারা জীবন ভুগছি। তাই কোনদিন বিশেষ কোন কারণে, যা আমার এখন মনে নেই, ডা. রায়ের মনে হয়েছিল, ক্লাসের বক্তৃতা নিজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছি না এবং নিকটের বন্ধুদেরও চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়েছি। তাতে আদেশ জারী হল—বক্তৃতার সময় সকলের থেকে পৃথক হয়ে বসতে হবে মঞ্চের রেলিং-এর ওপারে—সেখানে উপকরণ বোঝাই ক্লাসের টেবিল যেখানে গুরুদেব স্বয়ং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন প্রত্যহ। শাস্তির ফল আমার পক্ষে ভালই দাঁড়িয়ে গেল সব দিক থেকে। চোখ খারাপ, তাই কাছ থেকে এখন পরীক্ষাপর্বের প্রত্যেক অঙ্গটি নিখুঁত ভাবে দেখতে পেতাম। পিছনের খাস কামরায় আচার্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় তখন ব্যাপৃত থাকতো যেসব ছাত্রেরা, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও জমে গেল। নতুন অনেক পরীক্ষার কথা শুনতাম, কার্যবিধি দেখতাম—অবশ্য ক্লাস শেষ হবার পরে।/সত্য বলতে কি, গুরুর বিরাগভাজন হই নি কোন দিন—তাঁর সন্নেহ কিল চড় ঘুঁষি সর্বদাই জুটেছে” [রচনা সংকলন]।

এই বিবরণে সামান্য কৌতুকের ছোঁওয়া থাকলেও বুঝতে ভুল হয় না, রসায়নের বিভিন্ন দিকে সত্যেন্দ্রনাথের সক্রিয় আগ্রহের (সালফার-ঘটিত ওষুধ তৈরি) উৎপত্তিস্থল আসলে কোথায়! মুখে ‘বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার-এর চলমান উদাহরণ’ বলে সত্যেনকে ভর্ৎসনা করলেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যথেষ্টই স্নেহ করেন তাকে। সত্যেন্দ্রনাথের হয়তো কিঞ্চিৎ অভিমান ছিল গুরুর প্রতি, কখনোই ‘জ্ঞানত্রয়’-এর মতো তাঁর আপনার হয়ে উঠতে পারেন

নি বলে। এমনও বলেছেন, রাজাবাজারে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজটিকে আচার্য রায় সম্পূর্ণত রসায়ন বিভাগের অধিকারে আনবার চেষ্টায় ছিলেন। ঘরে ঘরে পাকা ড্রেন কাটা হয়েছিল নাকি তারই জন্যে, সহপাঠী শৈলেন ঘোষের চেষ্টায় তাঁর এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এই শৈলেন বিপ্লবী দলে ভিড়ে যখন পুলিশের হাতে প্রায় ধরা পড়েন, তখন আচার্য রায়ই তাঁকে লুকিয়ে রেখে আমেরিকা পালাতে সাহায্য করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের পড়ানো সম্পর্কে আর-এক বিবরণী মেলে তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের লেখনীতে। বলছেন, “তাঁহার ক্লাসে যখনই শিক্ষালাভ করিতে যাইতাম, অনুভব করিতাম চারিদিকে নতুন হাওয়া বহিতেছে। শিশুর মতন খোলা-মন লইয়া গুরুদেব আমাদের সকলকেই অতি আপনার জন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবার, আলাপ-আলোচনা করিবার, তর্ক করিবার, জানিয়া লইবার অবাধ স্বাধীনতা আমাদের ছিল। ...তাঁহার অপরিমিত স্নেহের প্রভাবে ও সত্যদৃষ্টিতে এবং পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানে আমরা আমাদের ভাবী জীবনপথের সন্ধান পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বড় দুঃখ ছিল। তিনি বলিতেন, পরীক্ষকের পেন্সিল মার্কার মানদণ্ডে এই শিক্ষার পরিমাপ হয়। তাই কোনও প্রকার গবেষণার রসধারায় আমাদের মানসক্ষেত্র উর্বর হয় না” [জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, আচার্য আমার, আত্মচরিত-এর মুখবন্ধ, ওরিয়েন্ট সংস্করণ]।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ সম্মানলাভ করার দাম প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে সত্যি বৈশি ছিল না। অনেক সময় তিনি বলতেন, এটি বাঙালি মস্তিষ্কের অপব্যবহার। এমন কি পরীক্ষায় অকৃতকার্য একাধিক ছাত্রকে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করে তিনি রীতিমতো ভালো ফল পেয়েছিলেন (জিতেন রক্ষিত, হেমেন সেন)। ফার্স্ট বয় হবার সুবাদে সত্যেন্দ্রনাথকেও ছাত্রজীবনে এবং প্রথম বয়সে তাঁর কাছে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল।

৩. আচার্যদ্বয়ের শিষ্যবৃন্দ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব কেবলমাত্র তাঁর মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কারেই সীমাবদ্ধ নয়, —নাইট্রাইট রসায়নের তিনি শ্রেষ্ঠতম নৃপতি—যে প্রতিষ্ঠা এসেছিল তাঁর অধ্যাপনা কালেই, হুগুয় চব্বিশ ঘণ্টা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে। অধ্যাপনা তাঁকে জুগিয়ে চলেছিল কৌতূহলী ছাত্রদের নানান অমীমাংসিত প্রশ্ন, যাঁদের সঙ্গে তিনি শিশুর মতো অবাধে মিশেছেন, তাদের মেধা ও ক্ষমতাবিচারের অখণ্ড অবকাশ পেয়েছেন। তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, প্রেসিডেন্সি কলেজে বা সায়েন্স কলেজে, তাঁকে ঘিরে রচিত বিশ্বমানের এক রাসায়নিক-গোষ্ঠী, যাকে বলা হত Indian School of Chemistry। সব চেয়ে বড়ো কথা, সেখানকার প্রতিটি ছাত্রই গবেষণাক্ষেত্রের বিস্তার ঘটিয়েছেন বিভিন্ন দিকে। অন্যতম ছাত্র নীলরতন ধর কলেজে থাকতেই ভৌত রসায়নের কাজ শুরু করেছিলেন। সেই একই ধারা বহন করে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তড়িৎ-বিশ্লেষণের কাজে ‘ঘোষ-এর নিয়ম’ প্রতিষ্ঠা (১৯১৮) করে বিশ্বকে এক সময়ে চমকে দিয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে পরবর্তী কালে দু-দুটি নোবেল-জয়ী কাজ সম্পন্ন হয় (ডেবাই-স্ককেল, অনসাগার)। সেই তিনি আবার আলোক-রসায়ন এবং শিল্প-রসায়নের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষে। একই ধারায় আরও কাজকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিয়ে গেছেন colloid chemistry ও ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রিতে, তারও পরে কৃষি-রসায়নে। নীলরতন

ধর পরে মুক্তিকা রসায়নে চলে গেছেন, বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণের ক্ষমতা-বৃদ্ধি করে কী করে মাটিকে আরও উর্বরা করা যায় সেই সংক্রান্ত কাজে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিদায়সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর এই স্কুল অফ কেমিস্ট্রির জয়গান গেয়েছিলেন অধ্যক্ষ হেনরি রোশের জেমস স্বয়ং, —দিনে দিনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রসায়নবিদ্যার প্রয়োগ-সম্ভাবনার বিস্তার ঘটিয়েছে এই গোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি, আচার্য রায় যেন উপনিষদ কথিত ‘একোহং বহুস্যাম’ (এক আমি বহু হইব) ইচ্ছাটিকে স্বয়ং পূর্ণ করেছেন।

দুই আচার্য মিলে এই যে-দুই ধারা বইয়ে দিলেন বাংলায়, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক তফাৎ কিছু ছিলই। পদার্থবিদ্যায় সার্থক উত্তরসূরী বলতে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শিশির-কুমার মিত্র। রসায়নে এই সংখ্যা বহুল: নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পুলিনবিহারী সরকার (বড়ো পুলিন), জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরেশচন্দ্র গুহ (জীববিজ্ঞান) এবং আরও অনেকে।

এঁদের সকলের মধ্যেই লক্ষণীয় অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণার বহু ধারাটি। গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ক্ষমতাও খানিক সঞ্চারিত হয়েছিল জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা (আলোর চাপ পরিমাপক যন্ত্র, গ্যাস আয়ননকুণ্ড), এমনকি সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেও (এক্স-রে ক্যামেরা তৈরি, তা দিয়ে এক্স-রে বিবর্তন করা, তাপীয়-বিকিরণ পোলারোগ্রাফি)। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, তাঁদের আপনাপন আবিস্কারের প্রেরণা জুটেছিল অধ্যাপনাসূত্রেই।

৩.১ তড়িদরসায়নের স্থপতি জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

ক্লাসে জ্ঞানচন্দ্র পড়াতেন ভৌত রসায়ন। এমন কিছু রাসায়নিক যৌগ আছে যারা এমনভাবে তড়িৎ পরিবাহী নয়, কিন্তু জলে বা অন্য তরলে দ্রবীভূত হলে তাদের তড়িৎ পরিবাহিতা বর্তায় (electrolyte বা তড়িদবিশ্লেষ্য), যেমন (খাবার) নুন জল। এটি অজৈব দ্রবণ, কারণ নুন অজৈব। এদেরকে বলে strong electrolytes, বা লবণজাতীয় তড়িদবিশ্লেষ্য। চিনি জৈব, তাকে জলে গুললে অবশ্য তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা জন্মায় না, কিন্তু চিনি ছাড়া অনেক জৈব যৌগ আছে যাদের সে ক্ষমতা আছে, এরা weak electrolytes। দুটি ক্ষেত্রেই পরিবাহিতার কারণ এক, যৌগ অণুগুলি যে পরমাণু দিয়ে গঠিত জল বা অন্য দ্রাবকে তাদের কেউ কেউ দু-একটা ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে বিপরীত তড়িদাধান-সম্পন্ন দুটি আয়নে ভেঙে যায়, তড়িৎপ্রবাহ ঘটে এই আয়নদের দাক্ষিণ্যে। দ্রবণে দ্রাবকের পরিমাণ বা ব্যটারির ক্ষমতাবদলে পরিবাহিতা-গুণমানের রকমফের ঘটে। জৈব দ্রবণের ক্ষেত্রে এই রকমফেরের নিয়মখানি জানাই ছিল। অজৈব দ্রবণের বেলায় সে নিয়ম অচল। পৃথিবী জুড়ে বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছিলেন নিয়মটি সেখানে কেমন হবে জানার। জ্ঞানচন্দ্রই সর্বপ্রথম একটি নিয়ম প্রস্তাব করেন, যার সুবাদে বিশ্বজোড়া খ্যাতি হয় তাঁর। কালক্রমে পরিমাপক যন্ত্রের উন্নতি হওয়াতে ‘ঘোষের নিয়ম’-এর ব্যত্যয় দেখা দেয়। পরে ডেবাই ও হুকেল এবং আরও পরে লার্স ওনসাগার-এর হাতে সঠিক নিয়মখানি পাওয়া হলে দেখা যায়, জ্ঞানচন্দ্রের মূল কাঠামোটি এসবে অক্ষুণ্ণ আছে। দু-দুবার নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং সে জন্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে তড়িদ-বিশ্লেষণের স্থপতি আখ্যা দিয়ে তাঁর অবদানকে সম্মান জানান। উল্লেখ্য, এটি আধুনিক ভৌত রসায়নে বিশ্বের সর্বপ্রথম কাজ [দ্র. অত্রি মুখোপাধ্যায়, আজি রইলে আড়ালে: আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, আলোচনাচক্র ১৮, জানুয়ারি ২০০২]।

১৯১৭-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণমান-নির্ধারণ ও সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্য, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাদেমি-সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার জোসেফ ফিলিপ হার্টগ যখন কলকাতায় আসেন, জ্ঞানচন্দ্র তখন বিজ্ঞান কলেজের সদ্যনিযুক্ত উপাধ্যায়, ক্লাসে জ্ঞানচন্দ্রের পড়ানো দেখে হার্টগ মুগ্ধ। তাঁর কাজের খ্যাতি তিনি আগেই শুনেছেন। এই কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হলে মনোনীত-উপাচার্য হার্টগই চব্বিশ বছরের যুবা (তখন লণ্ডনে অধ্যাপক ফ্রেডরিক ডনানের লেবরেটরিতে গবেষণারত) এই জ্ঞানচন্দ্রকেই সেখানকার রসায়ন বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে বিভাগটিকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। জ্ঞানচন্দ্র অচিরেই ঢাকায় জীবরসায়ন, সালোক-রসায়ন এবং শিল্পরসায়নেরও প্রবর্তন করেন। তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে ছাত্র আসতে থাকে। পরে বেঙ্গালুরুতে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধিকর্তা হিসেবে সি ডি রামনের স্থলাভিষিক্ত হলে সেখানে এবং তারও পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খড়গপুর আই আই টি-তে এ সর্বের প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটে। ঢাকাতে জ্ঞানচন্দ্রের পড়ানো নিয়ে রসায়নের প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রতুল-চন্দ্র রক্ষিত বলছেন, তাঁর মতো উৎকৃষ্ট শিক্ষক তখন সমগ্র দেশেই দুর্লভ ছিল। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, জটিলতম বিষয়ে তাঁর প্রাঞ্জল উপস্থাপন, সরল অথচ সূচাঙ্ক বাগ্মিতায় অজানা রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা এবং সর্বোপরি অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তাঁর স্নিগ্ধ কণ্ঠের ভাষণ মস্তমুগ্ধ করে রাখত ছাত্রদের। কখনও কখনও তিন ঘণ্টার উপর ক্লাস



জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

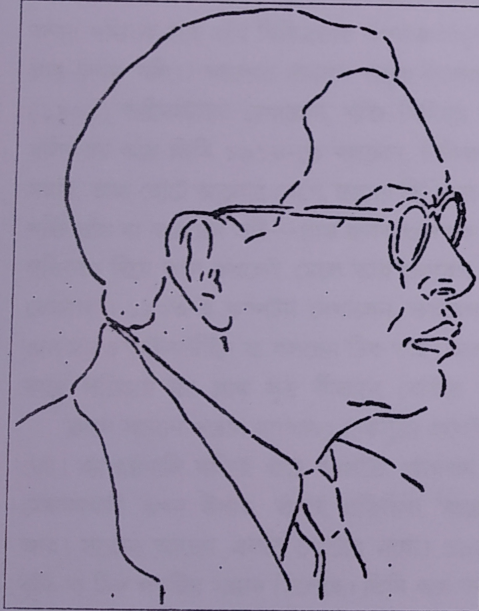
শিল্পী : গৌতম রায়

চলেছে, ছাত্ররা পরিশ্রাস্ত হওয়া দূরে থাক, ক্লাস শেষে খানিকক্ষণ বিমূঢ় থাকার পর, স্বপ্নান্তে জাগরণের মতো হঠাৎই সম্মিত ফিরে পেত, স্যর চলে গেছেন তার অনেক আগেই। যিনিই তাঁর ক্লাস করেছেন, বুঝেছেন কী পরিমাণ উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারতেন তিনি। ওঁর পড়ানো দেখে বোঝা যেত, পড়ানোটা একটা আর্ট এবং সেখানে তিনি এক নিপুণ শিল্পী [প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, পেরিয়ে এলেম]। এক সময়ে ঢাকায় জ্ঞানচন্দ্রের ছাত্র, ঢাকা হলের প্রাইম মিনিষ্টার ও কর্মজীবনে একদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব বিনয়রঞ্জন গুপ্তার কথায়, He was a teacher in real sense [সরোজ কুমার নাগ, বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও কালের মাত্রা]। এই কথাটির অর্থ বুঝি যখন অধ্যাপক রক্ষিত বলেন, “যাঁরা আমার জীবনকে

সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করব ড জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের, যাঁর কাছে আমি সবচেয়ে বেশি দিন লেখাপড়া করেছিলাম, আর যাঁর কাছে আমার সামান্য গবেষণার হাতে-খড়ি হয়েছিল। তাঁর মতো শিক্ষক কদাচিৎ দেখা যায়। আমার আরো অনেক খ্যাতিমান অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সেরকমটি আর দেখিনি। আমি নিজেও তো পাঁচ দশক ধরে অধ্যাপনা করলাম কিন্তু আমার সেই শিক্ষাগুরুর কাছাকাছি যেতে পারিনি” [প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, তদেব]। এও উল্লেখযোগ্য, জ্ঞানচন্দ্রের অনুপ্রেরণাতেই প্রতুলচন্দ্র গবেষণা অপেক্ষা অধ্যাপনাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র বলতেন, কিছু ভালো ছেলের অধ্যাপনায় যাওয়া উচিত।

৩.২ আধুনিক জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার জনক মেঘনাদ সাহা

মেঘনাদ ও সত্যেন, উভয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিয়ে যখন (১৯১৭) পড়াতে শুরু করলেন, বিজ্ঞানের জগতে তখন নতুন হাওয়া



মেঘনাদ সাহা

শিল্পী : সত্যজিৎ রায়

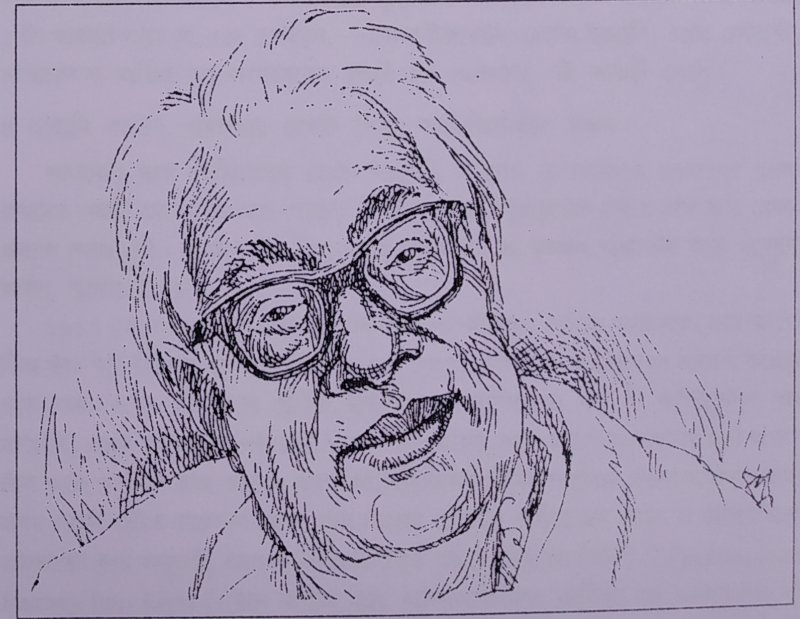
বইছে। ধ্রুপদী ধারণার সীমাবদ্ধতা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে, আইনস্টাইনের আপেক্ষবাদ, প্লাঙ্কের কণিকাবাদ, আইনস্টাইনের হাতে তার প্রামাণিক প্রতিষ্ঠা (আলোর প্রভাবে ধাতুর ইলেকট্রন উৎসর্জনের সার্থক ব্যাখ্যা), বরের পরমাণু-বিকিরণের সূত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। কথা ছিল, বিজ্ঞান কলেজের পাঠ্যক্রম হবে প্রেসিডেন্সি কলেজের থেকে আলাদা। দুজনে মিলে সেটি তৈরি করে প্রবল উৎসাহে এই সব নতুন বিষয় নিজেরা পড়ছেন, ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। মেঘনাদ যে ‘সাহা আয়নন সূত্র’ আবিষ্কার (১৯২০) করতে পারলেন, তা ক্লাসে পড়ানোর সুবাদে বরের ওই পরমাণু-তত্ত্বকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বলেই। গ্যাসকে ক্রমাগত উত্তপ্ত

করলে তার পরমাণুগুলির গতিশক্তি যে বাড়বে, ধাক্কাধাক্কিতে যে পরমাণুরা দু-একটা ইলেকট্রন খোয়াবে (অর্থাৎ পরমাণুর আয়নন ঘটবে), আর তাতে কী পরিমাণ শক্তি লাগে তার সম্যক উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল পড়াতে গিয়েই। এই সূত্রের ভিত্তিতে জানা হল নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপমানে একক আয়তনের গ্যাসের কতগুলি পরমাণু আয়নিত হতে পারে, আর তার ফলে সূর্য-তারার তাপমাত্রা ও উপাদান নির্ণয়ের একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বেরিয়ে এল। বিকিরণ চাপের ব্যাপারটিতেও সেই এক জিনিশ, ক্লাসে পড়াতেন গ্যাসের সৃতিবিজ্ঞান, সেখানে

দেখেছেন, গ্যাস-অণুদের মধ্যে বিক্রিয়া না-থাকলেও, তারা যখন দেওয়ালে ধাক্কা মারে তখন তাদের ভরবেগ চালান হয়ে যায় দেওয়ালে, আর তাতেই চাপের সৃষ্টি হয়। আইনস্টাইন বলেছেন বিকিরণ হল আলোকণা, যাকে ফোটন বলি, তার সমষ্টি; মেঘনাদের মনে হল, ভরবেগ যখন তাদের আছে, তখন চাপসৃষ্টি করার ক্ষমতাও তাদের থাকা স্বাভাবিক। মেঘনাদ যখন এলাহাবাদে গেলেন তখন সেখানে পদার্থবিদ্যায় গবেষণার কোনো সুযোগ-সুবিধাই ছিল না, তাঁর চেষ্টাতেই ক্রমে ক্রমে সেখানে একটি স্কুল অফ ফিজিক্স গড়ে ওঠে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা যেতেন তাঁর পড়ানো এবং গবেষণার সুখ্যাতির কারণে। ক্লাসে পড়ানোর সময়ে জগদীশচন্দ্রের মতো পরীক্ষা করে না-দেখালেও ম্যাজিক লণ্ঠনে স্লাইড প্রদর্শনীর মাধ্যমে মেঘনাদ বিষয়বস্তু সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন [DS Kothari, Biographical Memoirs of the Fellows of Royal Society, 5 (1959)]। ছাত্রদের মধ্যে বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রতাপকিশোর কিচলু, দৌলত সিং কোঠারি পরে ভারতীয় বিজ্ঞানসমাজকে ঋদ্ধ করেছেন নানা ভাবে। গবেষণাকর্মের ব্যস্ততার মধ্যেও ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে মেঘনাদ স্নাতক স্তরের উপযোগী তিনখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন, একাদিক্রমে ছ-সাত দশক ধরে সেগুলি ছাত্রদের কাছে তাপবিদ্যা ও আধুনিক পদার্থবিদ্যার নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ হয়েছিল।

৩.৩ কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের দিশারী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ক্ষেত্রে ক্লাসে পড়ানো আর তাঁর বিখ্যাত অবদানটির সম্পর্ক আরোই প্রত্যক্ষ। কি কলকাতায় কি ঢাকায়, তাঁকে পড়াতে হয় প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র। জানা ছিল,



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শিল্পী : অনুপ রায়

যে-বস্তু বিকিরণ শোষণ করে সে সেই বিকিরণ বিকীর্ণও করে, এইভাবে বস্তু আর বিকিরণ নিজেদের মধ্যে শক্তি বিনিময় করতে করতে অচিরে এমন একটা অবস্থায় চলে আসে যখন শোষণ আর বিকীর্ণ করার হার সমান হয়ে ওঠে, কম্পাঙ্কে-কম্পাঙ্কে বিকিরণের তীব্রতার বাঁটোয়ারা তখন একেবারে পাকা হয়ে যায়, তাপমাত্রা বদল না-হওয়া অবধি তার আর কোনো হেরফের নেই (তেমন বিকিরণকেই বলা হয় কৃষ্ণ বিকিরণ)। প্লাঙ্কের সূত্র (১৯০০) এই বিকিরণের বেলায় সেই বণ্টনখানির গাণিতিক প্রকাশ। উচ্চ এবং নিম্ন কম্পাঙ্কসীমায় খণ্ডাকারে এ সূত্রখানি পরীক্ষায় আভাসিত ছিল অনেক আগেই, এর সম্পূর্ণ চেহারাটি প্লাঙ্কের কাছে সহসা ধরা দিলেও জানা ছিল না কেন এমনটি হবে। প্লাঙ্ক যেভাবে এটি ব্যুৎপন্ন করলেন তাতে অসঙ্গতি থাকল অনেকটাই, এর একটি অংশ তিনি স্থির করলেন আলোর তরঙ্গ-ভাব ধরে (এটি ধ্রুপদী মত, তাতে শক্তি বিনিময় ঘটে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়), আর অন্যটির বেলায় তিনি আলোর কণাসত্ত্ব ধরতে বাধ্য হলেন—বস্তু আর বিকিরণের মধ্যে শক্তি বিনিময় যেন ঘটবে বিচ্ছিন্ন ধারায়—ঝলকে ঝলকে, কণাবর্ষণের মতো, —আর এখন যাকে ফোটন বলি সেই কণার শক্তিকে হতে হবে বিকিরণের কম্পাঙ্ক-অনুপাতী (আনুপাতিক ধ্রুবকটিকে এখন আমরা প্লাঙ্ক-ধ্রুবক বলি)। আলোর প্রভাবে ধাতুর ইলেকট্রন উৎসর্জনের মতো ঘটনার ব্যাখ্যা করে (১৯০৬) আইনস্টাইন দেখালেন, শক্তি বিনিময় সত্যিই বিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে। এই সমর্থনকে বলিষ্ঠতর করে তিনি ১৯১৬-তে বললেন, বিকিরণ আসলে পরস্পর বিক্রিয়াহীন ফোটনেরই সমষ্টি, তারা ছোট্টে আলোর বেগে, তাদের স্থিতিভর নেই কিন্তু ভরবেগ আছে, তাদের প্রত্যেকের শক্তি প্লাঙ্ক যা বলেছেন তাই—প্লাঙ্ক ধ্রুবক গুণিতক বিকিরণের কম্পাঙ্ক—আর এটিকে আলোর গতিবেগ দিয়ে ভাগ করলেই মেলে তার ভরবেগ (এর থেকেই চাপ-এর সন্ধান পেয়েছিলেন মেঘনাদ)। ১৯২৩-এ কম্পটন দেখালেন, ভরবেগ বলে ফোটনের একটি ধর্ম আছে বই কি, তার মানও আইনস্টাইন যা বলেছেন ঠিক তাই। আশ্চর্যের কথা, এসবের পরও আইনস্টাইনের কাছে পরিষ্কার নয় প্লাঙ্ক সূত্র কীভাবে বেরিয়ে আসে।

ক্লাসে সত্যেন পড়ান বাংলায়। প্লাঙ্কসূত্রে এলেই ব্যুৎপত্তিকরণের এই বর্ণসঙ্কর তাঁকে পীড়া দেয়। ব্যাপারখানি ঘনিয়ে ওঠে ঢাকাতে যোগদান করার পর। কলকাতায় তাঁর আড্ডাপতি মেজাজখানি তখন উধাও, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ‘বারোজনা’-র আড্ডাও তেমন করে জমে না আর। সত্যেন আছেন একটা ঘোরের মধ্যে। ১৯২৪-এর গোড়ায় তাঁর মনে হল, এইবারে বুঝি-বা ঠিক পথটির সন্ধান মিলেছে। তিনি শুরু করলেন আইনস্টাইন যেখানে শেষ করেছেন সেইখান থেকে। তিনি প্রথম থেকেই ধরে নিলেন, আলো আসলে আইনস্টাইন অনুমিত সমস্ত ধর্মাদর্ম-সম্পন্ন ফোটনসমষ্টি।

সুতরাং, কোনো কম্পাঙ্কে আলোর তীব্রতা নির্ভর করে সেই কম্পাঙ্কে যতগুলি ফোটন আছে তার ওপর। যে-কম্পাঙ্কে কম সংখ্যক ফোটন, তীব্রতা সেখানে কম, বেশি হলে বেশি। তাহলে জানতে হয়, একক আয়তনের বিকিরণের মধ্যে একই শক্তিবিশিষ্ট স্বতন্ত্র কতগুলি ‘একক (একটি কণার) অবস্থা’ আছে, যেখানে ফোটনরা থাকতে পারে। তারপর দেখতে হবে তার এক-একটিতে গড়ে কতগুলি ফোটন আছে। শক্তি দিয়ে সেই সংখ্যাটিকে গুণ করলেই সে

কম্পাঙ্কে আলোর তীব্রতা বেরিয়ে আসবে, অর্থাৎ প্লাঙ্ক সূত্র পাওয়া যাবে। সত্যেনের মনে হল এই ভাবে সমস্ত জিনিসটিকে দেখা উচিত।

এটি করতে গিয়ে তিনি অবস্থা গণনার যে-পদ্ধতি অবলম্বন করলেন এবং যে-ভাবে পুরো ব্যাপারখানি সম্পন্ন করলেন তা যেমন অভূতপূর্ব তেমনই দিগদর্শী [এর বিস্তারিত বিবরণ দেবার অবকাশ এখানে নেই, অন্যত্র নানাভাবে এটি আলোচিত হয়েছে, দ্র. অত্রি মুখোপাধ্যায়, যুগসন্ধির চরিত্র সত্যেন্দ্রনাথ বোস, আলোচনাচক্র, সংকলন ১৫, অগস্ট ২০০০ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বরণ্য বাঙালী বিজ্ঞানী গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১]। এতে একাধিক নতুন ধারণা যুক্ত হয় : এক, ফোটনরা অভিন্ন ; দুই, ষড়্‌মাত্রিক দশা (অবস্থান-ভরবেগ)-লোকের ন্যূনতম আয়তন প্লাঙ্ক-ধ্রুবকের ঘনফল (উল্লেখ্য, ১৯২৭-এ অর্থাৎ, এর তিন বছর বাদে ‘অনিশ্চয়তা সূত্র’-এর আকারে এ জাতীয় কথা আমরা হাইজেনবার্গের কাছ থেকে শুনি) —এরকম ক্ষুদ্রতম অংশই আসলে সত্যেনের উদ্দিষ্ট ‘একক অবস্থা’ যেখানে ফোটনরা থাকতে পারে ; তিন, ভরবেগ ও শক্তি ছাড়া ঘূর্ণি বলে ফোটনদের আরও একটি ধর্ম আছে যার মান হল ২ (১৯২৪-এ আইনস্টাইন এটিকে মানতে চান নি!) ; চার, প্রতিটি একক অবস্থায় ফোটন অবাধ সংখ্যায় থাকতে পারে ; এবং পাঁচ ফোটনের মোট সংখ্যা অনিত্য। এইভাবে এই প্রথম প্লাঙ্ক সূত্রের একটি সর্বসঙ্গত প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হল, আর এরই অনুসার হিশেবে জানা হল, বিশ্বে দু’ধরনের বস্তুকণা আছে, —এক, যারা মিশুক, একক অবস্থায় যারা থাকতে পারে অবাধ সংখ্যায় (এটির প্রতিষ্ঠা করেন আইনস্টাইন, সত্যেনের নিবন্ধ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই) —এরা বোসন অথবা বোস কণা ; আর দুই, যারা হিংসুটে, একক অবস্থায় যারা একটির বেশি থাকতে পারে না, এরা ফের্মিয়ন, —যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি। বস্তুত কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন বা অভিন্ন কণা-সংখ্যায়নের জন্মই হল সত্যেনের এই কাজটি থেকে।

৪ ভাঙানি ফোটন: চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, কারিয়ামানিক্কম কৃষ্ণন

পড়ানোর সঙ্গে আবিষ্কারের তেমন সরাসরি সংযোগ না-থাকলেও চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের কথাটি বলতে হয় অন্য কারণে। জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রের ধারার সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। সংযোগ যদি কিছু থেকে থাকে তো তা যুগপৎ অধ্যাপনা আর গবেষণা, অর্থাৎ, যুগের হাওয়া।

১৯১৭ থেকে রামন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক (তার আগেই কিন্তু তাঁর খান-ত্রিশেক গবেষণা-নিবন্ধ বেরিয়ে গেছে), ক্লাস নেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে আর কাজ করেন বৌবাজার স্ট্রীটের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কান্ট্রিভেশন অফ সায়েন্সে। রামন কলকাতায় পড়াচ্ছেন বলে দক্ষিণ ভারত থেকে ছাত্ররা কলকাতায় ছুটে আসেন তাঁর কাছে পড়বেন কাজ করবেন বলে, কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিবাস কৃষ্ণন এঁদের অন্যতম। রামন তখন পড়ান ভৌত আলোকবিজ্ঞান, তার আগের ক’ বছর পড়িয়েছেন তড়িৎ ও চৌম্বক তত্ত্ব। রামদাসের কথা অনুযায়ী, ছাত্রদের রীতিমত উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন তিনি [G Venkatraman, Journey into Light]। মনে রাখতে হবে, রামন-অভিক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় ১৯২৯-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি। সে-মাসের মাঝামাঝি কোনো এক দিনের ঘটনা, সহকারী কৃষ্ণন তরলে আলোর